ভূমিকা

২০২২-এর ৭ ডিসেম্বর বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার দেড়'শো বছর। এই দেড়শ বছরের ইতিহাসে বাংলা থিয়েটার নানা ঘটনা পরম্পরার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। বারবার তার গতি পরিবর্তিত হয়েছে। আবির্ভাব ঘটেছে বহু খ্যাতনামা নাট্য ব্যক্তিত্বের। এদেশে উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকেই অপেশাদার ও শৌখিন থিয়েটারের প্রচলন শুরু হয়। বাঙালির থিয়েটার চর্চা শুরু হয় নিতান্ত শখ-শৌখিনতার প্রয়োজনে। সাহেবদের বিলেতি থিয়েটারে নাটক দেখেই যে বাঙালির নাট্যাভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ও নাট্যবোধ গড়ে ওঠে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। এ প্রসঙ্গে আমরা একজন বিদেশীর নাম করতে পারি যিনি সর্বপ্রথম বাংলার নিজস্ব একটি রঙ্গালয় স্থাপন করে মঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় করেছিলেন। তিনি হলেন রুশ দেশীয় হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ। তাঁর 'বেঙ্গলী থিয়েটার' (১৭৯৫) প্রথম বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার। এরপর কলকাতার ধনী ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদের উৎসাহে ও আনুকূল্যে নাট্যমঞ্চ তৈরি করে নির্মিত হল বাঙালির নিজস্ব থিয়েটার। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারকেলডাঙ্গার 'হিন্দু থিয়েটার'(১৮৩১), শ্যামবাজারের 'নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটার' (১৮৩৩), পাইক পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের 'বেলগাছিয়া থিয়েটার' (১৮৫৮)। সেইসময় এই রকম অসংখ্য নাট্যশালা গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত এই সব থিয়েটারের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমোদ-প্রমোদ। একটা আভিজাত্যপূর্ণ শৌখিনতা এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। তবে শখ-শৌখিনতার কথা বাদ দিলেও বাঙালির নাট্যবোধ নির্মাণে এই ধরনের থিয়েটারের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। বাঙালির নাট্যচর্চার ইতিহাসে এই পর্বটির ইতিবাচক ভূ মিকা আছে বৈকি।

বাঙালি নির্মিত এই সব শৌখিন থিয়েটারে অভিনীত নাটকের নাট্যরস গ্রহণ থেকে সাধারণ বাঙালি দর্শক দীর্ঘদিন পর্যন্ত কিন্তু বঞ্চিতই ছিল। আর ঠিক এই কারণেই আজ থেকে দেড়'শ বছর পূর্বে ১৮৭২ সালে কয়েকজন নাট্যোৎসাহী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করলেন সাধারণ রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটার। উদ্দেশ্য রাজা, জমিদার, মুৎসুদ্দি পরিবারের বাঁধা মঞ্চের আওতা থেকে বের করে থিয়েটারকে জনতার উপভোগ্য করে তোলা, তাকে সার্বজনীন করে তোলা। প্রথম দিকে সেই অনুযায়ী সাধারণ রঙ্গালয়ে নাট্যভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সাধারণের জন্য থিয়েটারের দ্বার উন্মুক্ত হলো যখন, তখন পেশাদারিত্বের বিষয়টি অনিবার্য ভাবে এসে গেল। ফলে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। গড়ে উঠল একেরপর এক বাণিজ্যিক থিয়েটার। দর্শকের চাহিদা-রুচি অনুযায়ী বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলিতে নাট্যাভিনয় চলতে থাকে। কখনো পৌরাণিক, কখনো ঐতিহাসিক, কখনো সামাজিক, কখনো পারিবারিক আবেগ প্রধান কাহিনির মধ্যেই তখন

থিয়েটার ছিল আবর্তিত। এই ধরনের থিয়েটারের পরিমণ্ডলেই আবির্ভাব ঘটেছিল অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী এবং আরও পরবর্তীকালে শিশির কুমার ভাদুড়ীর মতন নাট্যব্যক্তিত্বের। আবির্ভাব ঘটে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কিংবা ত্রিশের দশকের মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখের মতো নাটককারদের। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে বাণিজ্যিক থিয়েটারের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও তাঁরা নাটক রচনা এবং নাট্যায়ন সবদিক থেকেই বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। এঁদের আত্মত্যাগ ও সাধনার পথ বেয়েই বাংলা থিয়েটার পরবর্তী স্তরে পৌঁছোয়। দেখা যাচ্ছে চল্লিশের দশকে এসে বাংলা থিয়েটার এবার তার গতি পরিবর্তন করে নতুন পথে বাঁক নিলো। ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হলো 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ', শুরু হল গণনাট্য আন্দোলন। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নতুন সমাজতান্ত্রিক চৈতন্য, পঞ্চাশের মন্বন্তরের করাল গ্রাস, স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বার জোয়ার সেই পুরোনো ভাবধারা ও সাহিত্য চেতনার সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়ে বাংলা মঞ্চে যে অপ্রত্যাশিত অথচ প্রার্থিত পালাবদল নিয়ে এলো তারই নাম গণনাট্য আন্দোলন। বাংলায় এই প্রথম পেশাদার বাণিজ্যিক থিয়েটারের বিকল্প একটি থিয়েটারের উঠে এলো। থিয়েটার আর শুধু ব্যবসায়িক প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। থিয়েটার হয়ে উঠলো জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার অন্যতম হাতিয়ার। এই থিয়েটার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের যাবতীয় বৈভব থেকে অনেকটাই সরে এসে হয়ে উঠলো সহজলভ্য। এমন নয় যে বাণিজ্যিক থিয়েটার উঠে গেল। তবে পেশাদার বাণিজ্যিক থিয়েটারের সমান্তরালে গণনাট্য সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত অবাণিজ্যিক থিয়েটারের একটা কনসেপ্ট বাংলা নাট্যজগতে প্রবল জনপ্রিয়তার সঙ্গে উঠে এলো।

স্বাধীনতার পর দেশগঠনের ব্যর্থতা,উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা মানুষের মনে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। শুরু হয় একের পর এক রাজনৈতিক আন্দোলন। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। চলে শাসকের দমন-পীড়ন। এই আবহেই জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বামপন্থী মতাদর্শ প্রসারিত হতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ইতিমধ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। মার্কসবাদীচিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী ছাত্র-যুব,শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত, শহর ও গ্রাম এককথায় সমস্ত স্তরের মানুষ তখন সেই আন্দোলনে উজ্জীবিত। সেই সময়কার সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ, জ্বালা-যন্ত্রণা কিংবা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলির অভিনয়ের মধ্যে পাওয়া সম্ভব ছিল না, বরং বাণিজ্যিক থিয়েটারে সামগ্রিক নাট্য পরিচালনায় গতানুগতিকতা ও একঘেঁয়েমি দর্শক সাধারণের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল। শিশির ভাদুড়ী অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন পুরনো নাটক

দিয়েই বাংলা থিয়েটারকে আকর্ষণীয় করে তোলেন, তেমনি বাস্তববাদী অভিনয়ের নতুন ধারার ইঙ্গিত দেন 'জীবনরঙ্গ', 'দুঃখীর ইমান' প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে। নতুন যুগে নতুন ভাবনায় ও পদ্ধতিতে নাটক পরিচালনায় তিনি যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাণিজ্যিক থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। আসলে সামগ্রিক ভাবে বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলি সমকালীন বাস্তব অভিঘাত থেকে ছিল দূরে। এই প্রেক্ষাপটেই বাংলা থিয়েটারে উঠে এলো গণনাট্য সঙ্ঘ। গণনাট্য সঙ্ঘ যে সেদিন বাংলা থিয়েটারের শরীরে এক ভিন্নমুখী গতি সঞ্চার করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গণনাট্য আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত এই সঙ্ঘ শেষ পর্যন্ত সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারল না। নানা মত ও মতের পার্থক্য এতো প্রবল হয়ে উঠল যে একটা সময় গণনাট্য সঙ্ঘ ভেঙে যায়। গড়ে ওঠে একটির পর একটি গ্রুপ থিয়েটার। মোটামুটি ১৯৫০-এর মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলা থিয়েটারে গ্রুপ থিয়েটারের ধারণা নতুন মাত্রা পায়। থিয়েটারকে রাজনৈতিক ভাবে প্রভাব মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ মিলে গঠন করলেন 'বহুরূপী' নাট্যগ্রুপ। বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ক্যালকাটা থিয়েটার'। উৎপল দত্ত প্রতিষ্ঠা করলেন 'এল টি জি' (১৯৪৯), এবং পরবর্তীতে 'পি এল টি জি'। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় খুললেন, 'নান্দীকার' (১৯৬০)। এর বাইরেও আত্মপ্রকাশ করে এরকম অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার। এইসব গ্রুপ থিয়েটারগুলি একটা সময় অভিনয় ও উপস্থাপনায় থিয়েটারের মানকে উতুঙ্গ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। বিশেষ করে বলতে হয় শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত কিংবা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্য ব্যক্তিত্বদের নাট্যকর্মের কথা। এঁদের নাট্যপ্রতিভার স্পর্শে গ্রুপ থিয়েটারগুলি তখন থিয়েটারের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। দর্শন চৌধুরী গ্রুপ থিয়েটারের সেই গৌরবময় ইতিহাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

''কতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কতো বর্ণময় উপস্থাপনা, ভাব ও ভাবনার কতো সংঘাতের চড়াই-উৎরাই, কতো আঘাত-প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার মানুষের শিল্পভাবনার স্তরকে উন্নত করে চলেছে। মানুষের চেতনার স্তরকে বিস্তৃত করে চলেছে। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার সেদিন মানুষকে জাগানোর দৃঢ় শপথ নিয়ে তারই শিল্পসম্মত মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে।বাংলা থিয়েটারের সে এক মহাসমারোহের কাল।''[১]

বাংলা থিয়েটারের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গ্রুপ থিয়েটারের সেই গৌরবময়

পর্বে পেশাদার বাণিজ্যিক থিয়েটার তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। সেই জায়গায় স্থানান্তর ঘটে গ্রুপ থিয়েটারের। পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটারগুলি আদর্শচ্যুত হয়ে ধীরে ধীরে প্রফেশন্যাল তথা পেশাদার থিয়েটারের পরিণত হয়। ষাট-সত্তরের দশকের অপেশাদার গ্রুপ থিয়েটার আশির দশকে এসে পেশাদার থিয়েটারে পরিণত হয়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্য ব্যক্তিত্বকেও গ্রুপ থিয়েটারে পেশাদারিত্বের পক্ষে সওয়াল করতে শোনা যায়। আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দেখা যায় গ্রুপ থিয়েটার শুধুমাত্র একটা সাইনবোর্ড মাত্র।তাঁদের নিজস্ব কোন দল নেই। দেবশঙ্কর হালদারের মতো নাট্য ব্যক্তিত্বও তাঁর প্রতিভাকে পুঁজি করে যখন যে দলে সম্ভব হচ্ছে থিয়েটার করে যাচ্ছেন। ঠিক এই জায়গা থেকেই নাট্যকর্মী বাদল সরকার ও তাঁর থিয়েটার কর্ম নিয়ে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা। বাদল সরকার আর পাঁচজন সাধারণ নাট্যকর্মীর মতই বাণিজ্যিক থিয়েটারের পরিমণ্ডলে তাঁর থিয়েটার কর্ম শুরু করেন। নাটক রচনা থেকে শুরু করে তার মঞ্চায়ন, সবটাই করেছেন বাণিজ্যিক থিয়েটারের চাহিদা মেনে। কিন্তু বাদল সরকার শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যিক থিয়েটারের যাবতীয় প্রলোভনকে উপেক্ষা করে বাংলা থিয়েটারে নির্মাণ করেছেন একটি স্বতন্ত্র পথ। গণনাট্য সঙ্ঘ-এর মতো কোন পার্টি পলিটিক্যাল থিয়েটার নয়, কিংবা গ্রুপ থিয়েটারগুলির মতো শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নয়, সম্পূর্ণ ভিন্নপথ ও পদ্ধতিতে বাদল সরকার তাঁর থিয়েটার কর্মকে একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছেন। নির্মাণ করেছেন বিকল্প তথা থার্ড থিয়েটার। যার মূল আদর্শ থিয়েটারকে যাবতীয় শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন, থিয়েটার কোন পণ্য নয় যে বিক্রি করা যায়। থিয়েটার সাধারণ মানুষের, থিয়েটার সর্বসাধারণের। তাই থিয়েটারকে তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, থিয়েটার করতে কারো কাছে হাত পাতবার প্রয়োজন হয় না,কিংবা অনুদানেরও প্রয়োজন নেই। গ্রুপ থিয়েটারগুলির অস্তিত্ব যখন আজ সংকটের মুখে, তখন আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বাদল সরকারের থিয়েটার ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বাদল সরকার কীভাবে একটু একটু করে নিজেকে নির্মাণ করলেন,কীভাবে পৌঁছলেন থিয়েটারের একটি বিশেষ দর্শনে— এককথায় নাট্যকর্মী বাদল সরকারের সম্পর্কে একটা নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করাই আমার এই গবেষণা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

নাটক লেখা, মঞ্চায়ন, অভিনয়, পরিচালনা করা— এই হল বাদল সরকারের পরিচয়।আমার গবেষণা প্রকল্পে তাই বাদল সরকারকে 'নাট্যকর্মী' শব্দবন্ধে অভিহিত করা হয়েছে। বাদল সরকার নিজেকে নাট্যকর্মী পরিচয় দিতেই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

''আমি কিন্তু নাট্যকার নয়,প্রধানত নাট্যকর্মী। নাটক লেখা,পরিচালনা করা আর অভিনয় করা— এইটে হচ্ছে আমার সত্যিকারের পরিচয়।''[২]

আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পে নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যাদর্শের স্বরূপ আমি নিম্নলিখিত অধ্যায় বিভাজন করেছি।

প্রথম অধ্যায় : নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় : নাট্যকর্মী বাদল সরকার

প্রসেনিয়াম থিয়েটার: প্রথম পর্ব

প্রসেনিয়াম থিয়েটার: দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় অধ্যায় : বাদল সরকারের নাট্যভাবনা : তৃতীয় ধারার থিয়েটার

চতুর্থ অধ্যায় : সমকালীন নাট্যকর্মী ও বাদল সরকার

পঞ্চম অধ্যায় : নাটককার বাদল সরকার

ষষ্ঠ অধ্যায় : পরবর্তীকালীন নাট্যচর্চায় বাদল সরকারের প্রভাব

আমার গবেষণা প্রকল্পে উক্ত অধ্যায়গুলির শিরোনামের দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যাদর্শের অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছি। আমার গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে নাট্যকর্মী বাদল সরকারের থিয়েটার প্রীতি, থিয়েটার নিয়ে তাঁর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তাঁর আগ্রহ পূর্ণাঙ্গ রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সেইসঙ্গে বাংলা থিয়েটারের জগতে তিনি যে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিলেন সেই বিষয়টিও এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মের অগ্রগতিতে প্রধানত তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি আমার এই গবেষণা কর্ম নাট্যকর্মী বাদল সরকার সম্পর্কে নতুন দিশা দেখাবে।

তথ্য সূত্র:

১. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক,১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-০৭৩,দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ-১১

২. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২ পৃষ্ঠা-৯৯